256895 - হজ্জ ও উমরার কার্যাবলি ও সেগুলোর ধারাবাহিকতায় নিহিত প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

আমি হিজ্জ ও উমরার সকল কাজের মাঝে নিহিত প্রজ্ঞা জানতে চাই। এগুলোর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় কী? যে ধারাবাহিকতায় এগুলো করা হয় তাতে কি প্রজ্ঞা রয়েছে? আমি উমরা ও হজ্জ করতে চাই। কিন্তু আমি এই বরকতময় কাজগুলো করার আগে প্রথমে প্রস্তুতি নিতে চাই; যাতে করে পরিপূর্ণ মনোযোগ ও বুঝ সহকারে এগুলো করতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

ইলাহী প্রত্যাদেশে (ওহী) হজ ও উমরার বিধানে নিহিত সাধারণ প্রজ্ঞাসমূহ অবহিত করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তাআলার এই বাণী যা তিনি সংক্ষেপে বলেছেন:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“আর মানুষের মধ্যে হজের ঘোষণা ঘোষণা করো; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল ক্ষীণকায় উটে সওয়ার হয়ে, গভীর গিরিপথ ধরে (দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিয়ে)। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং (যুলহজ্জিাহ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে) আল্লাহর দেওয়া চতুষ্পদ জন্তুসমূহ (কুরবানীর জন্য) যবাইকালে নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। তোমরা সেগুলোর মাংস (নিজেরা) খাও এবং গরীব-দুঃখীকে খাওয়াও। তারপর যেন তারা তাদের ময়লা (নখ, চুল ইত্যাদি) অপসারণ সম্পন্ন করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন ঘর (কাবা) তাওয়াফ করে। এটাই (করণীয়)। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহের সম্মান করবে, তার রবের নিকট সেটা তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের কাছে যেগুলো পাঠ করা হবে (ব্যতিক্রম হিসেবে উল্লেখ করা হবে) সেগুলো ছাড়া (সব) চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজার পঙ্কিলতা বর্জন করো এবং মিথ্যা কথা পরিহার করো।”[সূরা হজ: (২৭-৩০)]

- হজ ও উমরায় এবং এ দুটোর কার্যাবলিতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এর মধ্যে অন্যতম মিথ্যা কথা-কাজ পরিত্যাগ করা হয়, যার মধ্যে শিরক ও এর সকল রূপ, বহিঃপ্রকাশ ও স্তরসহ অন্তর্ভুক্ত। হজ ও উমরা একমাত্র আল্লাহর জন্যই সম্পন্ন করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলছেন:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"এবং আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা যথাযথভাবে সম্পন্ন করো।"[সূরা বাকারা: ১৯৬]

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "তিনি তাওহীদের তালবিয়া পাঠ করলেন: لَبَّيْكَ اللهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজির। আমি আপনার দরবারে হাজির। আমি আপনার দরবারে হাজির। আপনি নিরঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নেয়ামত আপনার-ই জন্য এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্য। আপনি নিরঙ্কুশ।)[সহীহ মুসলিম (১২১৮)]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলছেন: "হজের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। এটি কেবল হানীফরা (একনিষ্ঠ একত্ববাদীরা) উপলব্ধি করতে পারেন, যারা (আল্লাহকে) ভালোবাসার একটি অংশ নিজেদের মাঝে ধারণ করেছে। এর মর্যাদা এত ঊর্ধ্বে যে কোনো ভাষায় তা পুরোপুরি প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। এটি এই হানীফ দ্বীনের (একত্ববাদী ধর্মের) বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এমনকি কারো কারো মতে, আল্লাহর বাণী حُنَفَاءَ لِلَّهِ (হুনাফাআ লিল্লাহ) এর অর্থ: হাজীবৃন্দ।

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র ঘরকে (কাবা শরীফ) মানবজাতির স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এটি যেন বিশ্বের এমন একটি স্তম্ভ, যার ওপর এর পুরো কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। **'তরজুমানুল কুরআন' (**কুরআনের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকারী) ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলছেন, 'যদি পৃথিবীর সকল মানুষ এক বছরের জন্য হজ করা ছেড়ে দেয়, তবে আসমান জমিনের ওপর ভেঙে পড়বে।' সুতরাং এই পবিত্র ঘরটিই বিশ্বের অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু। যতদিন এই ঘরে হজ করার ধারা অব্যাহত থাকবে, ততদিন এই বিশ্বও টিকে থাকবে।

হজ মূলতঃ মিল্লাতে হানিফী বা একনিষ্ঠ তাওহীদি ধর্মের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য... কারণ এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কেবল বিশুদ্ধ একত্ববাদ এবং আল্লাহর প্রতি নিরেট ভালোবাসার ওপর।"[মিফতাহু দারিস সাআদাহ (২/৮৬৯)]

শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলছেন:

"গোটা হজ হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদের দিকে আহ্বান, তাঁর দ্বীনের উপর সুদৃঢ় থাকা ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার উপর অটল থাকার দাওয়াত। এর সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো মানুষকে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতার ধাবিত করা এবং হজসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ সত্য ও সঠিক আদর্শ দিয়ে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, তাতে তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করা।"

হাজী ও উমরাহকারী সর্বপ্রথম যা পাঠ করেন তা হচ্ছে তালবিয়া: 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক'। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর তাওহীদ ঘোষণা করে এবং ইখলাস প্রকাশ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো শরিক (অংশীদার) নেই। তাওয়াফেও সে এককভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁকে সম্মান করে এবং তাওয়াফের মাধ্যমে কেবল তাঁরই ইবাদত করে। সাঈতে শুধু তাঁর জন্যই সাঈ করে; অন্য কারো জন্য নয়। মাথা মুণ্ডন ও চুল কাটার ক্ষেত্রেও তাই। হাদী ও কোরবানির জন্তু জবাই এর ক্ষেত্রেও তাই। সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য। অনুরূপভাবে আরাফা, মুজদালিফা ও মিনাতে হাজিগণ যে সকল যিকির বা দুআ পাঠ করেন, তার প্রতিটিই আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর একত্ববাদের ঘোষণা, সত্যের দিকে আহ্বান এবং বান্দাদের জন্য সঠিক পথের দিশা যে, তাদের উপর আবশ্যক হলো এক আল্লাহর উপাসনা করা, এসব আমলে একে অপরের পাশে দাঁড়ানো, পারস্পরিক সহযোগিতা করা এবং সত্য ও কল্যাণের পথে একে অপরকে উপদেশ দেওয়া।"[মাজমূ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৬/১৮৬-১৮৭)]

- হজ্জে রয়েছে আল্লাহ তাআলার যিকির প্রতিষ্ঠা। হজের প্রতিটি মানাসিকে আল্লাহর যিকির রয়েছে, যেমনটি ইঙ্গিত করছে এই আয়াতে কারীমা: "এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন:

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"তারপর সব মানুষ যেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে তোমরাও সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ো, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের পালনীয় কর্তব্যসমূহ সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করো যেভাবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে, বরং তার চেয়েও বেশি করে।"[সূরা বাকারা: (১৯৯-২০০)]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

"বরং যিকিরই হজের রূহ, এর মূলসার ও উদ্দেশ্য। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপ— আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে'।"[মাদারিজুস সালিকিন (৪/২৫৩৭)]

শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“যিকির আল্লাহর এ বাণী: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ‘যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে।’-তে উল্লিখিত কল্যাণের (মানাফি) অন্তর্ভুক্ত। আয়াতে প্রথমে 'আম কল্যাণ' উল্লেখ করার পর 'খাস কল্যাণ' যিকিরকে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত: ‘তাওয়াফ, সাঈ ও জামরায় পাথর নিক্ষেপে—আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।’

কুরআনে কারীমে জবাই করার সময় আল্লাহর যিকির করা (আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা) বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। জামরায় পাথর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর যিকির করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। হজের সব ধরণের কথা বা কাজই হচ্ছে আল্লাহর যিকির। তাই হজ তার সকল কাজ ও কথাসহ সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর যিকির।”[মাজমু’ ফাতাওয়া ইবনে বায (১৬/১৮৫-১৮৬)]

- হজ ও উমরার মাধ্যমে হাজী ও উমরাহকারীদের জন্য এবং হারামের অধিবাসী ও সেখানে অবস্থানকারীদের জন্য বহু দ্বীনি ও দুনিয়াবি কল্যাণ সাধিত হয়। এই প্রজ্ঞার দিকেই এ আয়াতটি ইঙ্গিত করা হয়েছে: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ “যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে।”

শায়খ আবদুর রহমান আস-সাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“অর্থাৎ যাতে তারা বাইতুল্লাহর কাছে থেকে দ্বীনি কল্যাণ অর্জন করতে পারে। যেমন: মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহ ও যে ইবাদতগুলো কেবল বাইতুল্লাহ কেন্দ্রিকই করা সম্ভব। এবং দুনিয়াবি কল্যাণও অর্জন করতে পারে। যেমন: ব্যবসা-বাণিজ্য ও পার্থিব লাভ। এ সবকিছুই প্রত্যক্ষ বিষয়, যা সবাই জানে।”[তাফসীরুস সাদী (পৃ. ৫৩৬)]

এই কল্যাণসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে: দেশদেশান্তর থেকে মুসলমানেরা একত্রিত হওয়া, পরস্পর পরিচিত হওয়া এবং একে অপরের কাছ থেকে ইলম, ব্যবসা ও তথ্যের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া। এই সফরে তাদের সবার অভিন্ন অবস্থা, অভিন্ন পোশাক ও অভিন্ন উদ্দেশ্যে তাদের একতা বৃদ্ধি করে।

- সময়, স্থান, কাজকর্ম ও বেশভূষায় মুসলমানেরা অভিন্ন রূপে প্রকাশ পাওয়া। তারা সকলে একই সময়ে পবিত্র স্থানগুলোতে অবস্থান করেন। তাদের সকলের কাজ অভিন্ন, বেশভূষা অভিন্ন (লুঙ্গি ও চাদর) এবং সকলে মহান আল্লাহর সামনে বিনম্র ও অবনত।
- ওয়াজিব ও মুস্তাহাব উভয় প্রকার কুরবানী ও হাদীর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে পবিত্র বিষয়াবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এ পশুগুলোর নেয়ামতকে উপভোগ করা নিজে খাওয়ার মাধ্যমে, উপহার দেওয়া ও গরীবদের মধ্যে বণ্টন করার মাধ্যমে। দেখুন: মাজমূ’ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল আল-উসাইমিন (২৪/২৪১)

দুই:

হজ ও উমরার কাজগুলোর ক্রমবিন্যাসে নিহিত প্রজ্ঞা সুস্পষ্ট:

এ দুটির কাজ শুরু হয় ইহরাম ও তালবিয়া দিয়ে। এ দুটোর মাধ্যমে একজন মুসলমান হজ বা উমরাতে প্রবেশের এবং এর বিধিবিধান মেনে চলার ঘোষণা দেন।

মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফ দিয়ে শুরু করা হয়। কারণ বাইতুল্লাহ হলো হারামে বিদ্যমান মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস। আর 'তাওয়াফ' হলো হজ ও উমরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রুকন। তাই অন্য কিছুর আগে এটি দিয়ে শুরু করা সমীচীন।

বাইতুল্লাহ সংক্রান্ত কাজ শেষে অন্য কাজগুলো শুরু করা সমীচীন। আর তা হলো সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করা। কারণ সাফা-মারওয়া বাইতুল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি।

তারপর মিনায় রাত্রিযাপন করা। কারণ এটি হজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকন তথা আরাফায় অবস্থানের প্রস্তুতিস্বরূপ।

এরপর মুযদালিফায় রাত্রিযাপন করা হয়। কারণ এটি আরাফা থেকে বাকি অবশিষ্ট কার্যাবলির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে পড়ে। তাই কুরবানির দিনের কাজগুলোর জন্য প্রস্তুতিমূলক হাজীসাহেবের সেখানে বিশ্রাম নেওয়া যথোপযুক্ত।

এরপর জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা হয়। কারণ এটি মুযদালিফার পরবর্তী স্থান 'মিনায়' অবস্থিত।

এই দিনে মাথা মুণ্ডন করা ও কোরবানি করা যথাযোগ্য। কারণ এটি ঈদের দিন।

তারপর হজের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারায় আল্লাহর শোকর হিসেবে আসে কাবাকে 'তাওয়াফ করা'।

এরপর মিনায় রাত্রিযাপন করা হয়। এটি সেই স্থান যেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ছিল হজের হাদী জবাই করা। তাই হাজীর জন্য উপযুক্ত হলো: তাশরিকের দিনগুলোতে সেখানে অবস্থান করা। যেন তিনি আল্লাহর যিকির করতে পারেন, 'হাদী' (কুরবানীর পশু) জবাই করতে পারেন, নিজে খেতে পারেন এবং অন্যদের মাঝে বিতরণ করতে পারেন।

নুবাইশাহ আল-হুযালি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আইয়্যামুত তাশরিক (তাশরিকের দিনগুলো) হলো খাওয়া ও পান করার দিন।" অন্য এক বর্ণনায় আছে: "এবং আল্লাহর যিকিরের দিন।"[সহীহ মুসলিম (১১৪১)]

এই কারণেই এই দিনগুলোতে রোযা রাখতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি 'হাদী' (কুরবানীর পশু) পাবে না তার জন্য ব্যতিক্রম।

উরওয়াহ (রহঃ) আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন এবং সালিম (রহঃ) ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা

করেন যে, তারা উভয়ে বলেছেন: “তাশরিকের দিনগুলোতে রোযা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে যে ব্যক্তি হাদী (কুরবানীর পশু) পাবে না তার জন্য ব্যতিক্রম।”[সহীহ বুখারী (১৯৯৭)]

অবশেষে হাজীসাহেব মক্কায় গিয়ে বিদায়ী তাওয়াফ করবেন এবং মক্কা ত্যাগ করবেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“এই ইবাদতের মধ্যে নিহিত গূঢ়রহস্য সম্পর্কে বলব: ইহরাম, প্রচলিত অভ্যাস ত্যাগ, মাথা উন্মুক্ত রাখা, স্বাভাবিক পোশাক খুলে ফেলা, তাওয়াফ করা, আরাফায় অবস্থান করা, জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা এবং হজের অন্যান্য সকল কার্যাবলী ভালো হওয়ার পক্ষে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও সুষ্ঠু প্রকৃতি সাক্ষ্য দেয় এবং সুষ্ঠু বিবেক জানে যে যিনি এগুলোর বিধান আরোপ করেছেন তাঁর প্রজ্ঞার উপরে কোনো প্রজ্ঞা নেই।”[মিফতাহু দারিস সাআদাহ (২/৮৬৯)]

কিছু আলেম হজ ও উমরার কার্যাবলীর খুঁটিনাটি নানা প্রজ্ঞা অনুসন্ধানে ইজতিহাদ করেছেন।

এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে:

সেলাইযুক্ত কাপড় না পরার প্রজ্ঞা:

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

“আল্লাহ হাজীদের জন্য কেন সেলাইযুক্ত কাপড় পরা হারাম করেছেন এবং এতে নিহিত প্রজ্ঞা কী?”

কমিটি উত্তর দিয়েছে:

‘প্রথমত: আল্লাহ সামর্থ্যবান ও শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হজ করা ফরজ করেছেন এবং এটিকে ইসলামের রুকন বানিয়েছেন, যা দ্বীনের একটি অকাট্য ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হিসেবে সুবিদিত। সুতরাং মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, তাঁর আদেশের আনুগত্যস্বরূপ এবং তাঁর সওয়াবের আশা ও শাস্তির ভয়ে আল্লাহ তার উপর যা ফরয করেছেন তা পালন করা। এটি এই বিশ্বাসের সাথে যে— আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিধান ও সকল কাজে প্রজ্ঞাবান, তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তাই তিনি তাদের জন্য কেবল সে বিধান আরোপ করেন যেগুলো তাদের কল্যাণ আছে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের ব্যাপক উপকার রয়েছে। সুতরাং বিধান আরোপের মালিক হলেন আমাদের প্রজ্ঞাময় ‘মালিক’। আর বান্দার কর্তব্য হলো তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করা।

দ্বিতীয়ত: হজ ও উমরাকালে সেলাইকৃত কাপড় পরিহার করার যে বিধান দেয়া হয়েছে এর মধ্যে অনেক প্রজ্ঞা নিহিত। যেমন: কিয়ামতের দিন মানুষের অবস্থাকে স্মরণ করা। কারণ সেদিন তারা নগ্নপদে ও বিবস্ত্র অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। তারপর

তাদেরকে পোশাক পরানো হবে। আখিরাতের পরিস্থিতিগুলো স্মরণ করার মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষা রয়েছে।

যেমন: নফসকে দমন করা, বিনয়ের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করানো এবং অহংকারের পঙ্কিলতা থেকে নফসকে পবিত্র করা।

যেমন: নফসকে সাম্য, সমতা ও সরলতার নীতি অনুভব করানো, বিলাসিতা থেকে দূরে থাকা এবং গরিব-মিসকিনদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করা শেখানো।... এছাড়াও আল্লাহ যে পদ্ধতিতে হজ আদায় করার বিধান আরোপ করেছে এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন সেটার বিভিন্ন উদ্দেশ্য রয়েছে।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

আবদুল্লাহ ইবনে কু'উদ, আবদুল্লাহ ইবনে গুদাইয়্যান, আবদুর রাজ্জাক আফীফী, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায।'[ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ (১১/১৭৯-১৮০)]

তাওয়াফ ও হাজারে আসওয়াদ চুম্বনের মধ্যে প্রজ্ঞা:

শায়খ ইবনে উছাইমীন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“তাওয়াফের প্রজ্ঞা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: ‘বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপ— এগুলো কেবল আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।’ যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘরের চারপাশে তাওয়াফ করে তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি এমন সম্মান সৃষ্টি হয় যা তাকে আল্লাহর যিকিরে নিমগ্ন রাখে। হাঁটা, চুম্বন করা, হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানি স্পর্শ করা এবং হাজারে আসওয়াদের দিকে ইশারা করা— এই সকল শারীরিক নড়াচড়াও আল্লাহর যিকির। কারণ এগুলো আল্লাহর ইবাদতের অংশ। আর সকল ইবাদতই ব্যাপক অর্থে আল্লাহর যিকির। অন্যদিকে মুখে যা উচ্চারণ করা হয় তথা তাকবীর, যিকির ও দুআ, সেটা যে আল্লাহর যিকির তা তো সুস্পষ্ট।

আর হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করাও একটি ইবাদত। কারণ মানুষ এমন একটি পাথর চুম্বন করে যার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই; কেবল এই পাথরকে সম্মান করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করা ছাড়া এবং এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ছাড়া। এ প্রসঙ্গে আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাব্যস্ত হয়েছে: হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার সময় বলেছিলেন: ‘আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি কোনো ক্ষতি বা উপকার করতে পারো না। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।’

আর কিছু মূর্খ লোক মনে করে যে এর উদ্দেশ্য হলো এ পাথর থেকে বরকত লাভ করা— এর কোনো ভিত্তি নেই। তাই এটি

বাতিল।”[মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল ইবনে উসাইমিন (২/৩১৮-৩১৯)]

হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“মুহাল্লাব বলেছেন: ... হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা বিধান আরোপ করা হয়েছে পরীক্ষা হিসেবে, যাতে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় যে, কে আনুগত্য করে। এটি ইবলিসের সেই ঘটনার মতো যখন ইবলিসকে আদেশ করা হয়েছিল আদমকে সিজদা করার...। উমর (রাঃ) এর এই উক্তিতে রয়েছে: দ্বীনী বিষয়ে শরীয়ত প্রণেতার কাছে সমর্পণ এবং যেসব বিষয়ের যথাযথ কারণ জানা যায়নি সেগুলোর ক্ষেত্রে উত্তম অনুসরণ।

এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মহান নীতি: তিনি যা করেন সেক্ষেত্রে তাঁর অনুসরণ করা, যদিও সেই প্রজ্ঞা জানা না যায়।”[ফাতহুল বারী (৩/৪৬৩)]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন: “আল্লাহর কসম! আল্লাহ কিয়ামতের দিন এটিকে পুনরুত্থিত করবেন এমনভাবে যে এর দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে, একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং যে ব্যক্তি সত্যিকারের নিয়তে একে স্পর্শ করেছে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।”[তিরমিযী (৯৬১), তিনি বলেছেন এটি হাসান হাদীস। আলবানী ‘সহীহ সুনানে তিরমিযি’তে (১/৪৯৩) এটি সহীহ বলেছেন]

সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'ঈ করার মধ্যে প্রজ্ঞা:

শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

‘সাঈর প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা সহীহ দলিলে উদ্ধৃত এসেছে। তা হলো সহীহ বুখারিতে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বর্ণিত হাদীসে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কর্তৃক হাজেরা ও ইসমাঈলকে মক্কায় রেখে যাওয়ার ঘটনায় যা উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি তাদের কাছে খেজুরভর্তি একটি থলে ও পানিভর্তি একটি মশক রেখে গিয়েছিলেন। এই সহীহ হাদিসে আরও এসেছে: ‘ইসমাঈলের মা সেই পানি থেকে পান করতে ছিলেন এবং ইসমাঈলকে দুধ পান করিয়ে যাচ্ছিলেন । এক পর্যায়ে মশকের পানি শেষ হয়ে গেল। তখন তিনি ও তাঁর পুত্র পিপাসার্ত হলেন। তিনি দেখলেন শিশুটি পিপাসায় ছটফট করছে। তিনি এই দৃশ্য দেখতে না পেরে সরে গেলেন এবং খেয়াল করলে সাফা পাহাড় তাঁর সবচেয়ে নিকটে। তখন তিনি পাহাড়ের উপরে উঠে উপত্যকার দিকে তাকালেন কোনো মানুষকে দেখা যায় কিনা। তিনি কাউকেই দেখলেন না। তখন সাফা থেকে নেমে গেলেন। উপত্যকায় পৌঁছার পর কামিসের কিনারা উপরে তুলে ক্লান্ত মানুষের মতো দৌড় দিয়ে উপত্যকা পার হয়ে গেলেন। এরপর মারওয়ায় এসে মারওয়ার উপরে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাকিয়ে দেখলেন কোনো মানুষকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকে দেখলেন না। এভাবে সাত বার করলেন।’ ইবনে আব্বাস বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘এটাই মানুষের সাঈ

করার হেতু।’

এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ‘এটাই মানুষের সাঈ করার হেতু’-এর মধ্যে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করার প্রজ্ঞার প্রতি যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ হাজেরা এই সাঈ করেছিলেন অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে এবং আপনা প্রতিপালকের কাছে অভাবের চরম মুহূর্তে। কারণ তাঁর কলিজার টুকরা তাঁর পুত্র ইসমাঈল পিপাসায় ছটফট করছে এমন এক ভূমিতে যা জলশূন্য, জনমানবশূন্য। তিনি নিজেও ছিলেন ক্ষুধার্ত হয়ে ও পিপাসার্ত হয়ে তাঁর স্রষ্টার কাছে নিরুপায় অবস্থায়। এই মহাবিপদে পড়ে তিনি একবার এই পাহাড়ে উঠছিলেন। সেখানে কিছু না দেখে আবার অন্য পাহাড়ের দিকে দৌড়াচ্ছিলেন। এই আশায় যে, সেখানে কাউকে দেখবেন। তাই মানুষকে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে করে তারা অনুভব করে যে তাদের স্রষ্টা ও রিযিকদাতার কাছে তাদের প্রয়োজন ও অভাব সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে ঐ নারীর প্রয়োজন ও অভাবের মতন। এবং যাতে তারা স্মরণ করে যে, যে ব্যক্তি ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মতো আল্লাহর আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন না এবং তার দুআ বিফল করে দিবেন না।

এটি একটি সুস্পষ্ট গভীর প্রজ্ঞা যা একটি সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।”[আদওয়াউল বায়ান (৫/৩৪২-৩৪৩)]

মিনায় রাত্রিযাপনের মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা:

শাইখ আবদুল আযীয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

‘জামরায় পাথর নিক্ষেপে এবং মিনায় তিন দিন রাত্রিযাপনের মধ্যে কী প্রজ্ঞা নিহিত? আপনার কাছ থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট করার আশা করি। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।’

তিনি উত্তর দেন:

“প্রজ্ঞা না জানলেও একজন মুসলমানের উপর কর্তব্য হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা এবং শরীয়তের অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা এবং তাঁর কিতাব অনুসরণ করার আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন: اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ‘তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ করো।’ এবং তিনি আরও বলেছেন: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ ‘এটি একটি বরকতময় কিতাব যা আমি নাযিল করেছি, তোমরা এর অনুসরণ করো।’ এবং বলেছেন: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ‘আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো।’ এবং বলেছেন: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।’

তাই আপনি প্রজ্ঞা জানলে আলহামদুলিল্লাহ, না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই।

আল্লাহ যে যে বিধান আরোপ করেছেন এর প্রতিটির মধ্যে প্রজ্ঞা রয়েছে এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তারও প্রতিটির মধ্যে প্রজ্ঞা রয়েছে; হোক আমরা তা জানি বা না জানি।

জামরায় পাথর নিক্ষেপ:

স্পষ্টতই এটি শয়তানকে লাঞ্ছিত করা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্য করা।

মিনায় রাত্রিযাপনের প্রজ্ঞা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই ভালো জানেন। হয়তো এর প্রজ্ঞা হলো পাথর নিক্ষেপ সহজীকরণ। যদি হাজীসাহেব মিনায় রাত কাটায় তাহলে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকতে পারবে এবং নির্ধারিত সময়ে পাথর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারবে। আর মিনায় না থাকলে হয়তো পাথর নিক্ষেপে দেরি হয়ে যাবে অথবা পাথর নিক্ষেপ ছুটে যাবে অথবা পাথর নিক্ষেপ বাদ দিয়ে সে কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এর মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা সম্পর্কে মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবহিত।”[মাজমূ' ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত ইবনে বায (পৃ. ৩৮০-৩৮২)]

জামরায় কংকর নিক্ষেপে নিহিত প্রজ্ঞা:

শায়খ মুহাম্মাদ আমিন আশ-শানকিতি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

“জেনে রাখুন যে, নিঃসন্দেহে সামগ্রিক বিবেচনায় কংকর নিক্ষেপের মধ্যে নিহিত হিকমত হলো: আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা এবং তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বর্ণিত তাঁর আদেশ পালন করার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা।

আবু দাউদ তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ‘বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ এবং জামরায় কংকর নিক্ষেপ — এগুলো আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে।’

বর্ণনাকারী উবাইদুল্লাহ বিন আবু যিয়াদ হচ্ছেন: আল-কাদ্দাহ, হুসাইনের বাবা, মক্কাবাসী। একদল আলেম তাকে “ছিকাহ” বা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। অপর একদল আলেম তাকে “দুর্বল” বলেছেন। তবে তার বর্ণিত এই হাদীসের মর্ম নিঃসন্দেহে সহীহ। এর মর্ম সহিহ হওয়ার পক্ষে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর মর্মও সাক্ষ্য দেয়: “এবং নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক দিনগুলোতে আল্লাহকে স্মরণ করো”। কারণ নির্দেশিত যিকিরের মধ্যে জামরায় কংকর নিক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত। যার প্রমাণ রয়েছে পরের আয়াতে: ‘কেউ যদি তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে, তার কোনো পাপ হবে না।’ এটি প্রমাণ করে যে কংকর নিক্ষেপ করা আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে।

তবে এই প্রজ্ঞা সামগ্রিক। বাইহাকি রহিমাহুল্লাহ তাঁর সুনানে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফু হাদিসে বর্ণনা করেছেন: ‘যখন আল্লাহর খলীল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হজ্জের কার্যক্রম পালন করতে এসেছিলেন, তখন

জামরাতুল আকাবার কাছে শয়তান তাঁর সামনে প্রকাশিত হয়। তখন তিনি শয়তানকে লক্ষ্য করে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন; এক পর্যায়ে শয়তান মাটিতে দেবে যায়। তারপর দ্বিতীয় জামরার কাছে আবার প্রকাশ পায়। তিনি পুনরায় তাকে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এক পর্যায়ে সে মাটিতে দেবে গেল। তারপর তৃতীয় জামরার কাছে আবার প্রকাশ পেল। এবারও তিনি সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। এক পর্যায়ে সে মাটিতে দেবে গেল।' ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন: 'তোমরা শয়তানকে পাথর মারছ এবং তোমাদের পিতার মিল্লাতের অনুসরণ করছ।'

হাকিম তার 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে এই হাদীসটিকে 'মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তারপর বলেছেন: এটি শায়খাইনের শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ হাদীস, তবে তারা এটি বর্ণনা করেননি।

বাইহাকি যা উল্লেখ করেছেন এর ভিত্তিতে: কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহর যে যিকির প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলো: শয়তানের সাথে শত্রুতায় ইব্রাহিমের অনুসরণ করা। তাকে পাথর মারা এবং তার কাছে মাথা না নোয়ানো। আল্লাহ বলেছেন: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ইব্রাহিমের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" কাজেই কংকর নিক্ষেপ যেন শয়তানের সাথে সেই শত্রুতার প্রতীক ও ইঙ্গিত, আল্লাহ আমাদেরকে যেই শত্রুতা পোষণ করার আদেশ দিয়েছেন তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا "নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো।" এবং তাদের নিন্দা করেছেন যারা তার বন্ধু হয়: أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ 'তবে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে তাকে ও তার বংশধরদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু?' এটা সুবিদিত যে পাথর ছুঁড়ে মারা শত্রুতার সর্বাধিক বড় বহিঃপ্রকাশ।"[আদওয়াউল বায়ান (৫/৩৪০-৩৪১)]

আলেমরা হজ্জের কাজগুলোর প্রজ্ঞা সম্পর্কে যা বলেছেন তার মাঝে এই কিছু বিষয় যা আমরা পেয়েছি। এগুলোর বেশিরভাগই ইজতিহাদি বিষয়। এই প্রজ্ঞাগুলোর অধিকাংশের পক্ষে এমন কোনো দলিল নেই যে, এই মহান ইবাদতগুলোর বিধান আরোপের পিছনে উদ্দিষ্ট প্রজ্ঞা এটাই।

এই কারণে কিছু আলেম মনে করেন যে হজ্জের কাজগুলো সেই বিধানসমূহের অন্তর্ভুক্ত যার হেতু বোধগম্য নয় এবং এগুলো বিধিবিদ্ধ করা হয়েছে পরীক্ষা হিসেবে, বান্দারা তাদের প্রভুর প্রতি কতটা আনুগত্যশীল তা দেখার জন্য। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে পরীক্ষা করেন।

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:

"জেনে রাখুন, ইবাদতের মূল (উদ্দেশ্য) বোধগম্য। তা হলো বান্দা তার মাওলার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে অবনত হওয়া। নামাযে বিনয় ও অবনতি রয়েছে যা থেকে ইবাদতের ভাব বোঝা যায়। যাকাতে সহায়তা ও সহমর্মিতা রয়েছে যার অর্থ বোধগম্য। রোযায় নফসের প্রবৃত্তির দমন রয়েছে যাতে সে তার মাওলার প্রতি অনুগতভাবে ঝুঁকে পড়ে।

আর বাইতুল্লাহকে সম্মান করা ও সেটাকে কিবলা বানানোর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এর চারপাশে বিদ্যমান এলাকাকে হারাম বানানোর মানে বায়তুল্লাহর সম্মানকে বৃদ্ধি করা এবং মানুষ এলোমেলো চুল ও ধুলোয় আবৃত হয়ে আসা; যেন বান্দা লাঞ্ছিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তার মাওলার কাছে আসার মত — এটি বোধগম্য বিষয়।

নফস সেই ইবাদতে স্বস্তি পায় যা সে বোঝে। তাই প্রবৃত্তির ঝোঁকপ্রবণতা কাজটি করার জন্য সহায়ক ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী হয়। কিন্তু, কিছু বিধান এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যা নফস বোঝে না, যাতে করে নফসের পূর্ণ আনুগত্য সম্পন্ন হয়। যেমন: সাঈ ও কংকর নিক্ষেপে। এতে নফসের কোনো স্বার্থ নেই, স্বাভাবিক প্রকৃতির কোনো টান নেই এবং বিবেক এর হেতু খুঁজে পায় না। তাই এই আদেশ পালনের প্রণোদনা কেবল আদেশ মেনে চলা ও নিছক আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তুমি গভীর ইবাদতের রহস্যগুলো বুঝতে পারবে।"[মুসিরুল আযমিস সাকিন (পৃ. ২৮৫-২৮৬)]

সারকথা, হে সম্মানিত ভাই!

হজ্জ ও উমরা পালনের সময় বান্দার জন্য বিধিবিদ্ধ হলো: হাজী ও উমরাহকারী যা করা বিধিসিম্মত তা স্মরণ করবেন এবং তা করবেন। আর যার বিধান আরোপ করা হয়নি তা পরিত্যাগ করবেন। হজ ও উমরার প্রতিটি কাজে শরীয়ত যে যিকিরগুলো নির্ধারণ করেছে সেগুলো গভীরভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করবেন। কারণ পূর্বে আলোচিত হিসেবে এগুলো হজের মহান উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। হাজী ও উমরাহকারী যেন হজ ও উমরার কোনো সময় বৃথা নষ্ট না করেন। বরং সাধ্যমত আল্লাহর যিকির করার চেষ্টা করবেন এবং তাঁর রবের নিদর্শনসমূহকে যথাযথভাবে সম্মান করবেন।

আল্লাহ বলেছেন:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"এটাই (করণীয়)। আর যে আল্লাহর নিদর্শনাসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা হবে (তাদের) অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক।"[সূরা হজ: ৩২]

হজ্জ ও উমরার পদ্ধতি এবং এতে বিধিবিদ্ধ যিকির জানতে নিম্নোক্ত ফতুয়াগুলো দেখুন: (31822), (31819), (34744), (47732), (10508), (109246)।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।